নেহরু বাল পুস্তকালয়

রোহান্তা ও নান্দ্রিয়া

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লী

নেহরু বাল পুস্তকালয়—১৫
রোহান্তা ও নান্দ্রিয়া
রচনা : কৃষ্ণ চৈতন্য
অনুবাদ : আরতি সেন
চিত্রাঙ্কন : প্রণব চক্রবর্তী
৪'৪
২০০৮
ACC NO-15079

আমরা প্রায় সবাই বুদ্ধের কথা শুনেছি। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ বুদ্ধকে একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও মহানুভব শিক্ষাগুরুরূপে শ্রদ্ধা করে থাকে।

বুদ্ধ আসলে কারুর নাম নয়। বুদ্ধ কথার অর্থ যিনি জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত ; অর্থাৎ যিনি জীবনের নিগূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন এবং কিভাবে জীবনে সুখ ও শান্তি লাভ করা যায় তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। বুদ্ধের আসল নাম সিদ্ধার্থ। তিনি ছিলেন এক রাজার ছেলে। আজ থেকে প্রায় 2500 বছর আগে সিদ্ধার্থ জীবিত ছিলেন।

একদিন গভীর রাত্রে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর দেশের নানা স্থানে ঘুরলেন। সিদ্ধার্থ নিজের মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বলে তোমরা যেন একথা ভেবোনা যে তাঁদের

তিনি ভালবাসতেন না বা সংসারের প্রতি তাঁর কোনো টান ছিল না। এ কথা ঠিক নয়। সিদ্ধার্থ মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট দেখেছিলেন। তাই কি ভাবে তাদের দুর্দশা দূর করা যায় তারই একটা পথ খুঁজছিলেন তিনি। এই পথের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না।

ভোরবেলা ফোটা ফুলের পাপড়ির ওপর শিশির বিন্দুতে রোদ পড়লে কেমন হীরের মত ঝলমল করে। কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার সংগে সংগে সেই ফুল শুকিয়ে যায়। বসন্তে গাছে গাছে কত ফুল ফোটে। তারপর একে একে গ্রীষ্ম আসে, শরৎ আসে, তখন গাছের পাতা ঝরার পালা আর গাছে তখন ফুলও থাকেনা। ছেলেমেয়েরাও শিশু থেকে বড় হয়, জীবনটা তাদের খেলার মাঠের মত। কিন্তু বার্ধক্যকে তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না, শেষে একদিন মানুষ, শুধু মানুষ কেন, সব প্রাণীরই মৃত্যু হয়।

বোধহয় জগতের নিয়মই এই। তাই এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু যতদিন আমরা বেঁচে থাকি ততদিন কি সুখে শান্তিতে থেকে একে অন্যের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে পারি না? দেখেশুনে মনে হয় লোকে তা পারে না। বিনা কারণে বা অতি তুচ্ছ কারণে মানুষ পরস্পরকে ঘৃণা করে। প্রধানত জগতের অধিকাংশ দুঃখের কারণই এই। শুধু আর একটু কম স্বার্থপর হলে মানুষ পরস্পরের সংগে মানিয়ে চলতে পারে আর তাহলেই জগৎ হয়ে ওঠে আনন্দময়।

কি করলে মানুষ স্বার্থপরতা ত্যাগ করে অন্যের প্রতি সদয় হয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ব্যাকুলভাবে সেই পথেরই সন্ধান করছিলেন। তিনি জানতেন, রাজপ্রাসাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে তাঁর পক্ষে কখনই এ কাজ সম্ভব নয়।

যে দিন রাত্রে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করলেন সেদিন তাঁর স্ত্রী ও

শিশু পুত্র গভীর নিদ্রায় অচেতন। তাদের শয্যায় কত রকমের ফুল ছড়ানো, জুঁই আরো কত ফুল! বিদায় নেবার আগে রাজপুত্র বার বার ওদের দিকে চেয়ে দেখছিলেন। ছেলেকে ছেড়ে যেতে হবে একথা ভাবতেই তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। তিনি ভাবলেন, ওকে সংগে না নিয়ে তিনি যেতেই পারবেন না। কিন্তু রাজপুত্র দেখলেন, ঘুমের মধ্যেও মা তার ছোট্ট শিশুকে কেমন বুকের মধ্যে জড়িয়ে হাত দিয়ে আগ্‌লে শুয়ে আছে। তিনি ভাবলেন, "রাজ-কন্যার হাত সরাতে গেলে ঠিক তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে আর তাহলেই আমার আর যাওয়া হবে না। তার চেয়ে বরং মানুষের দুঃখ দূর করার যে পথের খোঁজে যাচ্ছি তার সন্ধান পেলে একবার এসে ছেলেকে দেখে যাব।"

বহু বছর ধরে নানা স্থানে ঘুরে আর কঠোর তপস্যার পর রাজপুত্র দেখলেন মানুষের জীবনকে সুখশান্তিময় করার যে পথ তিনি খুঁজছেন তা তো ইতি-পূর্বেই তিনি পেয়ে গেছেন—যে দিন রাত্রে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন সে-দিনই। ঘুমের মধ্যেও কি ভাবে মা নিজের হাত দিয়ে শিশুকে আগলে রাখে তা তো তিনি দেখেছেন। তবে তখন তিনি এর অর্থ বুঝতে পারেন নি। আজ তা বুঝেছেন, তাই বললেন, "মা যেমন নিজের শিশুকে রক্ষা করে, প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেক প্রাণীকে তেমনি ভালবেসে বিপদ থেকে রক্ষা করা।" মা যেমন নিজের শিশুকে যত্ন করে তেমনি প্রত্যেক প্রাণী

পরস্পরকে যত্ন করলে বড়দের সংসারও শিশু রাজ্যের মতই সুখী ও আনন্দ-মুখর হয়ে উঠবে। সকল প্রাণীর প্রতিই ছিল বুদ্ধের অপরিসীম দয়া ও মমতা। তাই তাঁর মৃত্যুর পরেও সবাই তাঁর করুণার কথা স্মরণ করত।

তোমরা জানো, সকল ধর্মের লোকেই বিশ্বাস করে যে সৎকর্ম করলে স্বর্গে গিয়ে চিরকাল সুখ ভোগ করা যায়। কিন্তু বুদ্ধ সম্পর্কে এই কাহিনী শোনা যায় যে তিনি স্বর্গসুখ চাননি কারণ পশু-পক্ষী, মানুষ প্রভৃতি সকল প্রাণীই এই পৃথিবীতে পুরুষানুক্রমে জন্ম নিচ্ছে। এদের সকলেরই দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য বুদ্ধের সাহায্যের প্রয়োজন। কাহিনীতে আরো বলা হয়েছে যে বুদ্ধ রাজপুত্র সিদ্ধার্থরূপে জন্ম নেবার বহু আগে মানুষের সেবা ও সাহায্যের জন্যে এই পৃথিবীতে বার বার জন্মগ্রহণ করেছেন। এই ধরণের বহু জনপ্রিয় কাহিনী প্রচলিত আছে। নানা দেশে বিভিন্ন যুগে কখনও জীবজন্তু রূপে, কখনও মানুষ রূপে জন্ম নিয়ে বুদ্ধ কি ভাবে দুঃস্থ প্রাণীকে সাহায্য করেছেন এইসব কাহিনীতে সেই কথাই আছে। এই সব কাহিনীর নাম জাতক, কারণ বুদ্ধের বিভিন্ন জন্মের ঘটনাই এইসব কাহিনীর বিষয়বস্তু। এক সময় জাতক কাহিনীগুলি পালি ভাষায় লেখা হয়। প্রাচীনকালে মগধের (বিহার) লোকে পালি ভাষায় কথা বলত। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিও এই পালি ভাষাতেই লেখা।

পালি ভাষায় রচিত জাতক সংগ্রহে সাড়ে চারশোর বেশী কাহিনী আছে। কাহিনীগুলি এক মহা মূল্যবান সম্পদ। এর প্রথম কারণ, কাহিনী হিসেবে এগুলি চমৎকার। পালি ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় এগুলি বিশদভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ভারতের ভাস্কর শিল্পীরা সাঁচী, ভারহুত ও অমরাবতী প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলিতে পাথরের গায়ে এই সব কাহিনীর চিত্র খোদাই করে এদের এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, শিল্পীরাও তুলির রেখায় আর বর্ণে এই কাহিনীগুলিকে নবরূপে রূপায়িত করেছিলেন—অজন্তা গুহার প্রাচীর গাত্রে প্রায় সকল জাতক কাহিনী এই ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।

এখানে তোমাদের দু'টি কাহিনী বলব: রোহান্তা নামে এক কালো হরিণ আর নান্দ্রিয়া নামে এক বানরের গল্প। এদের পরোপকারিতা আর আত্ম-ত্যাগের কথা পড়লে তোমাদের মনেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না যে করুণাময় বুদ্ধ এই পৃথিবীকে আরো সুখ ও সহৃদয়তাপূর্ণ করে তোলার জন্যেই বারবার এখানে জন্ম নিয়েছেন।

কালো হরিণ—রোহান্তা

বহুকাল আগে উত্তর প্রদেশের এক বনের ধারে এক প্রান্তরে একটি কালো হরিণের জন্ম হয়। হরিণের মা-বাবা তার নাম রেখেছিল রোহান্তা।

তোমরা কি কখনও কালো হরিণ দেখেছ? হরিণদের মধ্যে এই কালো হরিণই বোধহয় দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। একমাত্র ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলেই এই হরিণ দেখা যায়। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হরিণের দেহের রং কুচকুচে কালো আর পেটের দিকটা সাদা। এদের মাথায় বাঁকানো শিং। দেখতে ভারী সুন্দর। স্ত্রী হরিণ আকারে ছোট, মাথায় শিং নেই কিন্তু দেখতে পুরুষ হরিণের মতই সুন্দর। এদের গায়ের রং হরিদ্রাভ-বাদামী। ছোটবেলায় রোহান্তার গায়ের রং এমনি ছিল। তারপর সে তিন বছরে পা দিতেই তার গায়ের রং দাঁড়াল কুচকুচে কালো। তা দেখে রোহান্তার মা-বাবা তো দারুণ খুশী কারণ গায়ের রঙের এই পরিবর্ত্তনের মানেই হল, তাঁদের বাচ্চা এখন স্বাবলম্বী হয়েছে অর্থাৎ সে নিজেই নিজেকে দেখাশুনো করতে পারবে।

মা-বাবার সঙ্গে রোহান্তা হরিণের যে দলটায় থাকত তাতে প্রায় একশো হরিণ ছিল। প্রতি বছরই দলের কিছু বুড়ো হরিণ মারা যেত কিন্তু তাতে হরিণের মোট সংখ্যায় কোন ইতর বিশেষ হত না। কারণ বেশী-বয়সী হরিণরা যেমন মারা পড়ত তেমনি হরিণের নতুন বাচ্চাও হত। মা হরিণের পেট

থেকে এক সঙ্গে একটা কি দুটো বাচ্চা হত। বাচ্চাদের মা পরম যত্নে বেশ কিছুদিন লম্বা ঘাসের নিচে লুকিয়ে রাখত। তারপর তারা গায়ে একটু বল পেলেই দলে এসে ভিড়ত।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোহান্তার বুদ্ধিও প্রখর হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে দলের নিয়ম কানুনও সে চটপট রপ্ত করে ফেলল। ঘাসই ছিল হরিণদের প্রধান খাদ্য তবে বনের ধারে শস্যের ক্ষেত-খামার দেখলে কখনও কখনও তারা সেখানে ঢুকে পড়ে পেট ভরে শস্যের দানা খেয়ে আসত। বনের মধ্যে খোলা মাঠে দল বেঁধে চরতে চরতে হরিণেরা মনের আনন্দে ঘাস খেত। আর বিপদের গন্ধ পেলেই মাঠের লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে পড়ত। এইভাবে মাঝ দুপুর পর্যন্ত তারা মাঠে চড়ত আবার বেলা পড়লে বিকেলের দিকে চড়তে আসত। ভর দুপুরে রোদের যখন খুব তেজ সেই সময়টায় হরিণেরা শুয়ে বসে একটু জিরিয়ে নিত। ওদের ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি ছিল খুব প্রখর। তাছাড়া ছুটতেও তারা পটু। এই শেষের দুটোই ছিল তাদের রক্ষাকবচ। পৃথিবীর যে সব প্রাণী সব চেয়ে দ্রুত দৌড়তে পারে তাদের মধ্যে কালো হরিণও আছে—এরা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল একটানা দৌড়তে পারে। প্রথমে মাটি থেকে উঁচুতে লাফ দিয়ে চলার সুরু, মাটি থেকে খাড়া লাফ মেরে শূন্যে প্রায় কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে যায়। প্রথমে কয়েক ধাপ এভাবে চলার পর সুরু হয় দৌড়ের পালা—চার পা এক সঙ্গে তুলে প্রায় হাওয়ার বেগে প্রস্থান। হরিণের পাল যখন ছুটে চলে সে এক

ভারী আশ্চর্য দৃশ্য, মনে হয় প্রাণীগুলো যেন বিনা উদ্যমে স্বাভাবিক সুন্দর ভাবে বাতাসে ভর করে উড়ে চলেছে।

রোহান্তা তখন খুব ছোট। সেই সময়কার একটা ঘটনা থেকে তার বুদ্ধি কত প্রখর ছিল তা বোঝা যায়। বনের মধ্যে অনেক সময় আপনা থেকে বুনো আম গাছ জন্মায়। পাখীরা পাকা আম খেতে এসে ডালে বসে ঠোঁট দিয়ে কেটে অনেক আম গাছের নিচে ফেলে দেয়। হরিণেরা এইসব আম খায়। আবার গাছের খুব নিচু ডালে যে সব আম ঝোলে সেগুলোও ওরা নাগালের মধ্যে পেলে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খায়। এক ব্যাধ সেই বনে রোজ শিকারের খোঁজে আসত। গাছের নিচে হরিণের পায়ের দাগ দেখলেই সে সেই গাছের উঁচু ডালে ছোট মাচা বেঁধে পাতার ঝোপের আড়ালে হরিণের অপেক্ষায় বসে থাকত। তারপর হরিণ কাছে এলেই বল্লম ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেলত। হরিণ মেরে তার মাংস ও চামড়া বেচে লোকটার পেট চলত।

একদিন রোহান্তা দেখল একটা গাছের খুব নিচু ডালে অনেক পাকা টুকটুকে আম ঝুলছে, অসংখ্য পাকা আম গাছের নিচেও পড়ে রয়েছে। রোহান্তার তখন বয়স কম, স্বাস্থ্যও ভাল তাই পেটে ক্ষিদেও খুব। সেদিন পেট পুরে সে পাকা আম খেল। কিন্তু তখনো গাছে ঢের আম ঝুলছে। রোহান্তা ঠিক করল পরের দিন আবার সেখানে আম খেতে আসবে।

সে চলে যাবার একটু পরেই ব্যাধ সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মাটিতে রোহান্তার পায়ের তাজা ছাপ তার নজরে পড়ল। সে তখুনি গাছে উঠে সেখানে একটা মাচা বেঁধে ফেলল তারপর সেদিনকার মত ঘরে ফিরে গেল। পরদিন খুব ভোরে উঠে খাওয়াদাওয়া সেরে ব্যাধ তাড়াতাড়ি বনে এসে মাচায় চড়ে বসে থাকল। হাতে তার তীর ধনুক তৈরী। শুধু শিকার আসার অপেক্ষা। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল কিন্তু কারুর দেখা নেই। হঠাৎ ব্যাধের চমক ভাঙ্গলো। সে দেখে, ছোট একটা হরিণ গাছটার দিকে এগিয়ে আসছে। এ হরিণ রোহান্তা ছাড়া আর কেউ নয়।

ব্যাধ যেমন হরিণের পায়ের দাগ চেনে রোহান্তাও তেমনি ব্যাধের পায়ের ছাপ বুঝতে পারত। ব্যাধ খুব সাবধানে চলাফেরা করলেও মাটিতে তার ছু'একটা পায়ের ছাপ পড়েছিল। মাথা তুলে একবার গাছটার দিকে চাইতেই রোহান্তার সন্দেহ হল, পাতাগুলো যেন কেমন এলোমেলো হয়ে রয়েছে। রোহান্তা বিপদের গন্ধ পেল। গাছের একটু দূরে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রোহান্তা আর এগোয় না দেখে ব্যাধ ওদিকে অধীর হয়ে উঠল। রোহান্তা কিছুতেই নড়ছে না দেখে সে আর থাকতে না পেরে গাছ থেকে একটা পাকা আম ছিঁড়ে এমনভাবে ছুঁড়ে দিল যাতে সেটা মাটিতে পড়ে রোহান্তার দিকে গড়িয়ে যায়। ব্যাধ ভাবল, পাকা আম দেখে আরও আমের লোভে হরিণটা গাছের দিকে এগিয়ে আসতে পারে।

আমটা তার দিকে গড়িয়ে আসতেই রোহান্তার আর বুঝতে বাকী রইল না যে কেউ তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সে আর একবার ভালো করে গাছের পাতাগুলো দেখল বিশেষ করে যেখানটা কালকের চেয়ে অন্য রকম মনে হচ্ছিল। প্রথমে সে কিছুই টের পেল না কিন্তু ভাগ্যক্রমে তখনই বাতাসে গাছের পাতাগুলো নড়ে উঠল। তেমন জোর বাতাস নয় কিন্তু তাতেই গাছের ডালপালা যেটুকু নড়ে উঠল তারই ফাঁকে ব্যাধকে সে দেখতে পেল।

কিন্তু রোহান্তা যে তার শত্রুকে দেখতে পেয়েছে এমন কোনো ভাবই দেখাল না, শুধু বলল, "ভাই গাছ, এতদিন তোমার ফল সোজা মাটিতে ফেলে দিতে কিন্তু আজ দেখছি ঢিলের মত তা আমার দিকে ছুঁড়ে মারছ। তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, আজকাল আর তুমি আমায় চাও না। তাই অন্য গাছের কাছে গিয়ে দেখি যদি বন্ধুর মত ব্যবহার পাই।"

একটা বাচ্চা হরিণের এই ধৃষ্টতা দেখে ব্যাধ তো মনে মনে খুব বিরক্ত হল। হরিণটা যে তাকেই ঠাট্টা করছে তা বুঝতে আর তার বাকী রইল না। কিন্তু আর কোনো উপায় নেই দেখে সে রোহান্তাকে লক্ষ্য করে একটা বল্লম ছুঁড়লো। রোহান্তা বল্লমের নাগালের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল কাজেই তার গায়ে লাগল না। ব্যাধকে আরো ক্ষেপাবার জন্যে মাটি থেকে বল্লমটা মুখে করে তুলে নিয়ে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

আর একবার রোহান্তা এমনি বিপদে পড়েছিল কিন্তু সেবার এত সহজে রেহাই পায়নি। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একবার সে ফাঁদে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে রোহান্তা একটু ভয় পেয়েছিল কিন্তু তারপরেই মন থেকে সে ভয় ঝেড়ে ফেলল। মাথা ঠাণ্ডা করে পালাবার উপায় চিন্তা করতেই হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। ফাঁদ থেকে বেরুবার জন্যে রোহান্তা কিন্তু একটুও ছটফট করেনি কারণ সে জানত সে যত দাপাদাপি করবে ফাঁদের গেরো আরো শক্ত হয়ে তার ওপর ততো চেপে বসবে। তখন সে আরো নিরুপায় হয়ে

পড়বে। রোহান্তা নিজের পাগুলো ছড়িয়ে লম্বা হয়ে এক পাশ চেপে মাটির ওপর শক্ত হয়ে শুয়ে থাকল। সে খুর দিয়ে পায়ের কাছের মাটি আর ঘাস চারিদিকে ছিটিয়ে দিল তারপর চোখ উল্টে মাথাটা এক পাশে কাৎ করে পড়ে রইল। সে জিভটাকে মুখ থেকে বের করে রেখেছিল বলে জিভের লালায় তার সর্বাঙ্গ ভিজে নোংরা দেখাচ্ছিল আর এরই আকর্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে তাকে ছেঁকে ধরেছিল। কয়েকটা কাকও উড়ে এসে সেই সময় তার শক্ত শরীরটার উপর বসেছিল।

সময় যেন আর কাটে না। সন্ধ্যের মুখে ব্যাধ সেখানে এলো তার ফাঁদের ফলাফল কতদূর কি হয়েছে তাই দেখতে। দূর থেকে হরিণকে জালে পড়তে দেখে সে ভারী খুশী হল কিন্তু কাছে এসে দেখল ব্যাপার খুব সুবিধের নয়। কাকগুলো তখনও রোহান্তার নিশ্চল দেহটার ওপর বসেছিল। তার সারা শরীরে তখনও মাছি ভনভন করছে। হরিণের পায়ের চারপাশে ছড়ানো মাটি ও ঘাস দেখে ব্যাধের মনে হল হরিণটা মরবার আগে খুব ছটফট করেছে। ব্যাধ হরিণের কাছে এগিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখল, তার জীবনের কোনো লক্ষণই নেই। তখন সে বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলল, "আমার বরাতটাই খারাপ। হরিণটা ঠিক সাত সকালে জালে পড়েছে। পালাবার জন্যে ছটফট করে শেষে গলায় দড়ির ফাঁস আটকে মরেছে। মনে হচ্ছে, ওর শরীরটা এরই মধ্যে পচতে সুরু করেছে। এখন এই মাংস বাড়ী নিয়ে গেলে একেবারে অখাদ্য হয়ে যাবে।
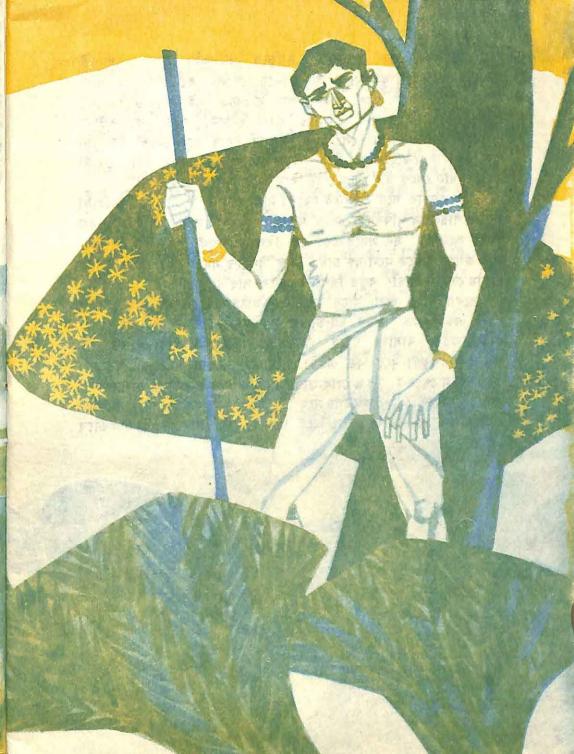
তার চেয়ে বরং ওকে কেটেকুটে ছাড়িয়ে খানিকটা মাংস এখানেই খাওয়া যাক। বাকী মাংস বাড়ী নিয়ে গেলেই হবে।" এই বলে ব্যাধ জালের ফাঁস খুলে ফেলল আর হরিণকে সেই অবস্থায় ওখানেই ফেলে রেখে সে আগুণ জ্বালাবার জন্যে শুকনো পাতা কাঠ-কুটরো জোগাড় করতে গেল। সে একটু নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতেই রোহান্তা এক লাফে ঝেড়েমেরে উঠে পড়ল তারপর একদম ঘাড় সোজা করে সেখান থেকে তীর বেগে দৌড় দিয়ে নিজের দলে ফিরে এল।

বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে রোহান্তা বুঝতে পারল যে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা চমৎকার হলেও জীবনে বিপদও আছে অনেক। সব সময়ে একা একা বিপদের সম্মুখীন হওয়াও মুশকিল, তাই জগতে বাঁচতে হলে বন্ধু চাই। বন্ধু বিপদের সময় এসে যেমন পাশে দাঁড়ায় তেমনি আবার বন্ধুর বিপদেও তাকে সাহায্য করা চাই।

বনের ধারে লম্বা ঘাসে ভর্তি যে মাঠটায় রোহান্তা থাকত, সেই বনেই একটা বড় গাছের মগ-ডালে এক কাঠঠোকরা বাসা করেছিল। কাঠঠোকরার বাসার কাছে ছোট একটা ডোবার মধ্যে থাকত এক কচ্ছপ। কিছুটা দূরে বড় একটা সরোবরে সন্ধ্যের সময় হরিণের দল আসত জল খেতে। কিন্তু রোহান্তা সেই ডোবাতে জল খেতেই ভালবাসত। কারণ সেখানে গেলে কচ্ছপের সঙ্গে একটু গল্প গুজব হত। সেই সময় কাঠ-ঠোকরাও বাসা থেকে নেমে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিত। এইভাবে

তিনজনের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল।

একদিন এক ব্যাধ সেদিক দিয়ে যেতে যেতে ডোবার ধারে রোহান্তার পায়ের দাগ দেখতে পেল। লোকটা কিছুদিন আগে এদিকে একবার এসেছিল কিন্তু তখন ডোবায় বনের কোনো জন্তু-জানোয়ার জল খেতে আসে তেমন হদিশ পায়নি। এখন সে দেখল একটা হরিণ প্রায়ই সেখানে জল খেতে আসে। হরিণটাকে ধরবার জন্যে ব্যাধ ডোবার ধারে চামড়ার ফালি দিয়ে তৈরী একটা ফাঁদ পাতলো। কচ্ছপ তখন ডোবার মধ্যে বিশ্রাম করছিল কাজেই ব্যাধের ফাঁদপাতা তার নজরে পড়েনি।

সন্ধ্যের সময় ডোবায় জল খেতে এসে রোহান্তা ফাঁদে আটকে পড়ল। তার চিৎকার শুনে দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি ছুটে এল। কচ্ছপ ডোবার পাড়ে উঠে এল আর কাঠঠোকরা সেখানেই একটা পাথরের ওপর বসল।

কাঠঠোকরা কচ্ছপকে বলল, "বন্ধু, তোমার দাঁত তো খুব শক্ত। তোমাকেই এই জাল দাঁত দিয়ে কাটতে হবে। মনে হচ্ছে, চামড়ার দড়ি ভারী শক্ত। কাটতে তোমার হয়ত অনেক সময় লাগবে। এদিকে

আমি দেখি কতদূর কি করতে পারি। তোমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাধটাকে ওদিকে আটকে রাখতে হবে সে যাতে এদিকে এসে না পড়ে।"

একটু দূরে বনের ধারে খোলা মাঠের মধ্যে একটা কুঁড়ে-ঘরে ব্যাধ থাকত। কাঠঠোকরা সেখানে গিয়ে হাজির হল। কুঁড়ের সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। সেখানে একটা গাছ। তাতেই কাঠঠোকরা সারারাত বসে রইল। সকাল হতেই ব্যাধ ছুরি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ব্যাধকে দেখে কাঠঠোকরা খুব জোরে চিৎকার করতে করতে তার দিকে উড়ে গেল। তাকে ডানার ঝাপ্‌টা মেরে তার মাথায় বিষ্ঠা ত্যাগ করল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাধ এসব অশুভ লক্ষণ বলে বিশ্বাস করত। সকালে কাজে বেরুবার সময় এভাবে মাথায় পাখীর ময়লা পড়া নিশ্চয়ই খুব খারাপ লক্ষণ। একথা চিন্তা করে সে সকালে কাজে বেরুবে না ঠিক করল।

বিকেলের দিকে আবার সে কাজে বেরুবার কথা চিন্তা করে ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখল, পাখীটা আছে না আপদ বিদায় হয়েছে। কিন্তু কাঠঠোকরা সেখান থেকে নড়েনি। সে জানালা দিয়ে ব্যাধকে উঁকি মারতেও দেখেছিল। ব্যাধ ভাবল, ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে পাখীটা আর তার সঙ্গে নষ্টামী করতে পারবে না। কিন্তু কাঠঠোকরাও কম চালাক নয়, সেও ঠিক ব্যাধের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। তাই ব্যাধ পিছনের দরজা দিয়ে যেমন বেরিয়েছে অমনি কাঠঠোকরা ব্যাধের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে তার মুখে চোখে ডানার ঝাপটা মারল আর ঠোঁটের খোচা দিয়ে ব্যাধের সর্বাঙ্গ বিষ্ঠায় নোংরা করে দিল। ব্যাধ রেগে আগুন। সে কাঠঠোকরাকে তাড়া করে ধরতে গেল। তার টুঁটি টিপে আজ সে তাকে মেরেই ফেলবে। কাঠঠোকরা দেখল ব্যাধের সঙ্গে এখন লড়াই করতে গেলে তার ফল খারাপ হবে। এই ভেবে সে একটা গাছের উপর থেকে ব্যাধের উপর নজর রাখল। রাগের চোটে ব্যাধের তখন হিতাহিত জ্ঞান নেই। সে মরিয়া হয়ে ঠিক করল লক্ষণ ভাল হোক আর

খারাপই হোক আজ সে ডোবার ধারে যাবেই। কাঠঠোকরা দেখল, ব্যাধ রেগে হনহন করে ডোবার দিকেই চলেছে তাই সে আর একটু সময় নষ্ট না করে বন্ধুদের সতর্ক করার জন্যে তীর বেগে ডোবার ধারে উড়ে গেল।

ততক্ষণে কচ্ছপ ফাঁদের সব দড়িই দাঁতে চিবিয়ে কেটে ফেলেছিল। শুধু একটা মাত্র শক্ত দড়ি কাটতে তখনও বাকী। কচ্ছপের সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল তার দাঁতগুলো বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। কাঠঠোকরা গিয়ে খবর দিল, ব্যাধ আসছে। একথা শুনে কচ্ছপ আরো জোর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি জাল কাটতে লাগল। যন্ত্রণায় সে তখন আর ভাল করে মুখ নাড়তে পারছেনা। ব্যাধকে ছুরি হাতে দৌড়ে আসতে দেখে রোহান্তা সর্বশক্তি দিয়ে একবার জালটা ছেঁড়বার চেষ্টা করল। ব্যাধ যখন তার কাছ থেকে আর মাত্র কয়েক হাত দূরে ঠিক সেই মুহূর্তে জালের শেষ দড়িটা ছিঁড়ল। ছাড়া পেয়ে রোহান্তাও নিমিষে বনের মধ্যে দৌড় দিল। কাঠঠোকরা উড়ে একটা গাছের মাথায় গিয়ে বসল। কিন্তু সারা রাত আর সারা দিন জাল কেটে বেচারা কচ্ছপ এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ক্লান্ত দেহ নিয়ে তার আর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। সে সেইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

রাগে দুঃখে ব্যাধ সামনে কচ্ছপকে পেয়ে তাকেই একটা থলির মধ্যে পুরে থলির মুখ বন্ধ করে সেটা একটা গাছের নিচু ডালে ঝুলিয়ে রাখল। বনের মধ্যে ছুটে পালাবার সময় রোহান্তা ঘাড় ফিরিয়ে ব্যাধের এই কাণ্ড দেখল। দৌড়ের ঝোঁকে হঠাৎ সে এভাবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল যে সামলাতে না

পারলে আর একটু হলেই সে উল্টে পড়ত। রোহান্তা ভাবল, তার প্রাণ রক্ষার জন্যে যে বন্ধু এত কষ্ট করল তাকে এভাবে বিপদের মধ্যে ফেলে সে কি করে পালাবে? তখুনি তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে খানিকটা দৌড়ে হোঁচট খাওয়ার ভান করল। আবার উঠে যন্ত্রণায় যেন ভাল করে চলতে পারছে না এমন ভাব দেখিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খানিকটা গিয়ে আবার হোঁচট খেল। এই দেখে ব্যাধ ভাবল হরিণটা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাই জোরে দৌড়তে পারছেনা। এই সুযোগে সে হরিণকে ধরে ফেলবে এই মতলবে ছুরি বাগিয়ে ব্যাধ তার পিছনে ধাওয়া করল।
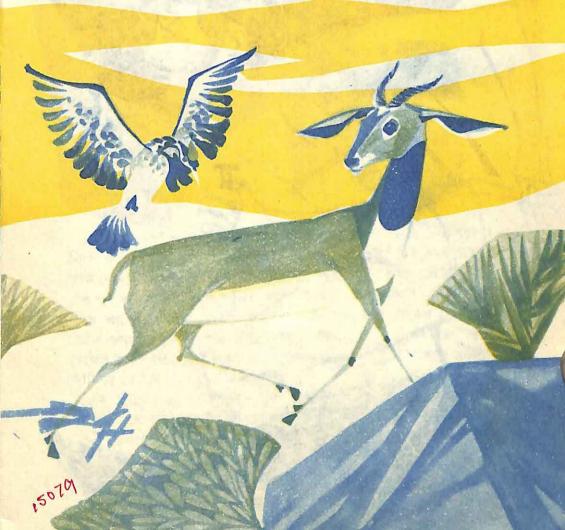
রোহান্তা একইভাবে হোঁচট খাওয়ার ভান করে এগিয়ে চলল কিন্তু বরাবর নিজেকে ব্যাধের নাগালের বাইরে রাখল। এইভাবে এক সময় ব্যাধের কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে এসে সে তার চোখে ধূলো দিয়ে নিমিষে অন্য পথ ধরে ঝড়ের বেগে আবার কচ্ছপের কাছে ফিরে এল। নিজের শিং দিয়ে গাছে ঝোলানো থলিটাকে একটু উঁচু করে তুলে ধরতেই সেটা ডাল থেকে কসকে মাটিতে পড়ে গেল। এবার থলির মুখটা কেটে ফাঁক করে দিতেই কচ্ছপ তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রোহান্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডোবার মধ্যে ঢুকে গা ঢাকা দিল।

এই ভাবে বছর কাটে আর সেই সঙ্গে তরুণ রোহান্তারও বয়স বাড়তে থাকে। সে এখন দলের বয়স্ক হরিণদের একজন। দলের সবচেয়ে বেশী বয়সী যে হরিণ তাদের দলপতি ছিল সে মারা যেতে সবাই মিলে রোহান্তা-কেই তাদের দলপতি নির্ব্বাচিত করল।

দলের কেউই কিন্তু ঘুণাক্ষরে টের পায়নি যে তাদের সাংঘাতিক এক বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

হরিণেরা যে বনে আর খোলা মাঠে থাকত সেটা ছিল বারাণসীর রাজার রাজ্যের এলাকার মধ্যে। বারাণসীর বৃদ্ধ রাজা মারা গেলে তাঁর ছেলে রাজা হলেন। নতুন রাজা শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। রাজার এই শিকারের শখের ফলে শুধু যে জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যেই আতঙ্কের সৃষ্টি হল তা নয়, রাজ্যের প্রজাদের ওপরেও খুব অত্যাচার শুরু হল। কারণ রাজা শিকারে বেরুলেই তাঁর হুকুম ছিল গ্রামের আর শহরের সব লোক তাঁর সঙ্গে যাবে। সকলে চারপাশের জংগল তাড়িয়ে হরিণদের ঘিরে ফেলত আর রাজা তখন মহানন্দে তীর-ধনুক দিয়ে হরিণ শিকার করতেন। নতুন রাজা এই ভাবে প্রায় রোজই শিকারে যেতে লাগলেন। ফলে প্রজাদের কাজকর্ম করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাদের রুজি রোজগারের পথও প্রায় বন্ধ হল।

এর কি বিহিত করা যায় তাই নিয়ে বিচার-বিবেচনার জন্যে রাজ্যের প্রবীণ লোকেরা এক সভা ডাকলেন। রাজার প্রাসাদটা ছিল বিরাট এক চত্বরের ঠিক মাঝখানে। দলের এক বৃদ্ধ পরামর্শ দিলেন, "এই খোলা চত্বরের চার পাশে বেড়া দিয়ে এই জায়গায় সুন্দর ঘাস গজাবার ব্যবস্থা করতে হবে আর সেই সঙ্গে এখানে কয়েকটা ডোবাও খুঁড়তে হবে। এর ফলে হরিণের দল এখানে এসে থাকতে পারবে, তাদের ঘাস-জলের কোনো অভাব হবে না। আমরা সবাই মিলে একদিন হরিণদের বন থেকে তাড়িয়ে এই ঘেরা-দেওয়া সংরক্ষিত জায়গাটার মধ্যে নিয়ে আসব। হরিণেরা তখন রাজার প্রাসাদের

কাছাকাছিই থাকবে। কাজেই রাজা ইচ্ছামত হরিণ শিকার করতে পারবেন। এতে আমরা অন্তত রাজার জুলুমের হাত থেকে বাঁচব।"

বৃদ্ধের পরামর্শ সকলেরই মনে লাগল। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, এ খুব ভাল কথা। তখন তারা রাজার কাছে গিয়ে একথা পাড়তেই রাজাও মহানন্দে এতে সায় দিলেন। হয়রানির হাত থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাবার আশায় সবাই মিলে মহা উৎসাহে জায়গাটায় ঘাস ও গাছ বুনতে আর ডোবা খুঁড়তে লেগে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে সুন্দর এক সংরক্ষিত উদ্যান তৈরী হল। চারপাশে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হলে সকলে লাঠি-সোঁটা নিয়ে একদিন বনটাকে ঘেরাও করল। তারপর ঝোপেঝাড়ে যত হরিণ ছিল তাদের তাড়া দিয়ে খোলা জায়গায় নিয়ে এল। তারপর ঢাক-ঢোল পেটানো আর হল্লা শুরু হল। সেই বাদ্যের শব্দে আর সোরগোলে প্রাণ ভয়ে সব হরিণ এসে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। হরিণেরা সেখানে ঢুকতেই ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল। তখুনি রাজাকে খবর
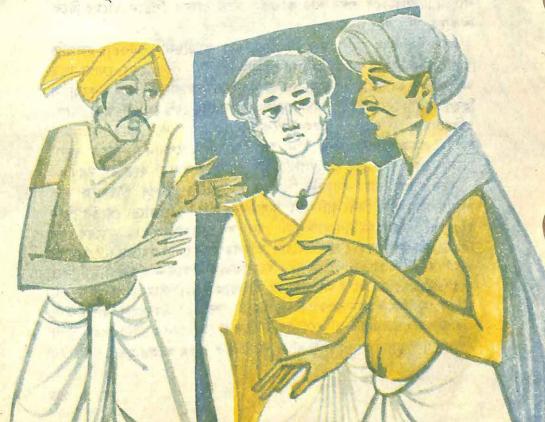
পাঠানো হল, ইচ্ছা করলে তিনি এখন সারাদিন হরিণ শিকার করতে পারেন। লোককে এখন আর কাজকর্ম ছেড়ে রাজার পিছনে গ্রামের দিকে শিকারে যেতে হবে না।

কালো হরিণের দুটো দল এর মধ্যে ধরা পড়েছিল। একটার দলপতি ছিল রোহান্তা আর অন্যটার দলপতির নাম হিরণ। সেও বেশ যোগ্য আর অভিজ্ঞ। কিন্তু রোহান্তা যেমন দলের সবাইকে ভালবাসা দিয়ে জয় করেছিল হিরণ আবার নিজের দলে নিয়মানুবর্তিতার ওপরেই বেশী জোর দিত। রাজা হরিণদের সংগে তাদের দুই দলপতিকেও দেখলেন। দেখে তাঁর খুব পছন্দ হল। এমন সুন্দর হরিণ তিনি আর কখনো দেখেননি। রাজা হুকুম দিলেন, কেউ যেন এই দুই দলপতি হরিণের গায়ে কখনো হাত না দেয়।

নতুন রাজা প্রায় রোজই শিকারে বেরুতেন। নিপুণ তীরন্দাজ বলে রাজার মনে মনে বেশ খানিকটা অহংকার ছিল। শিকারে গেলেই তিনি হরিণদের নিয়ে প্রথমটায় খানিকটা খেলাতে ভালবাসতেন। তাদের বেশ কিছুটা দূরে পালিয়ে যেতে দিতেন তারপর লক্ষ্যভেদ করতেন। তাছাড়া একটা হরিণ শিকারের পর সে দিন আর দ্বিতীয় শিকার করতেন না। কিন্তু সংরক্ষিত উদ্যানের মধ্যে এই ভয়ংকর তীরন্দাজ রাজা এসে উপস্থিত হলেই হরিণেরা আতংকে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করত। এর ফলে রাজা তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে একটি হরিণকে ধরাশায়ী করে সেদিনের মত শিকারের পালা শেষ করার আগেই বেশ কিছু হরিণ সাংঘাতিক রকম আহত হত।

এইভাবে হরিণেরা অযথা কষ্ট পাচ্ছে দেখে রোহান্তা একদিন হিরণকে বলল, "বন্ধু, আমাদের বরাত সত্যই খারাপ। কারণ রোজই আমাদের দলের একজনের মৃত্যু সুনিশ্চিত, যদিও একথাও ঠিক যে আজ হোক, কাল হোক সবাইকেই একদিন মরতে হবে। এমনকি আমরা যখন বনে ছিলাম তখনও সব সময় ব্যাধ, কৃষক বা বুনো জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে রেহাই

পেতাম না। কিন্তু এটা ভারী আফসোসের কথা যে আমাদের একজন এভাবে রোজ প্রাণ দেওয়া সত্বেও তার সংগে আরো অনেকে অযথা আহত হয়ে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে।"

হিরণ বলল, "ব্যাপারটা খুব দুঃখের তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এতে আমাদের কিছুই করবার নেই মনে হয়।"

রোহান্তা বলল, "না, একটা রাস্তা আছে। আমরা রোজ সকলের ভাগ্য পরীক্ষা করব। তাতে যেদিন যার নাম উঠবে সেদিন তাকে স্বেচ্ছায় রাজার শিকারের লক্ষ্যবস্তু হতে হবে। এইভাবে একদিন আমার দল থেকে আর পরদিন তোমার দল থেকে পালা করে একজনকে বেছে নেওয়া হবে। এতে লাভ হবে এই যে, বাকী হরিণেরা অযথা আঘাত থেকে বাঁচবে।" রোহান্তার কথায় হিরণ তখুনি রাজি হল।

রাজার শিকারের খুব শখ ছিল একথা ঠিক কিন্তু তিনি রোজ একটি মাত্র হরিণই শিকার করতেন। তাছাড়া অন্য হরিণেরা অযথা আহত হোক এটা তিনিও চাইতেন না। সুতরাং হরিণদের এই প্রস্তাবে তিনিও রাজি হলেন। কিন্তু এভাবে একটি করে হরিণ রোজ তাঁর কাছে প্রাণ বলি দিতে এগিয়ে আসবে এটা তাঁর মোটেই মনঃপুত হল না কারণ তিনি তো আর কসাই নন। তাই বাগানের পুরোনো বেড়ার বাইরে খানিকটা জায়গা ছেড়ে তিনি আর একটা বেড়া দিয়ে দিলেন। পুরোনো ও নতুন বেড়ার মাঝখানে যে জায়গাটা রইল সেটা অনেকটা ঘোড়দৌড়ের পথের মত। সারা বাগানটার চারপাশ ঘিরে এমনি পথ থাকল। এই পথের এক জায়গা চিহ্নিত করে রাজা সেখানে

ভিতরের বেড়ায় ফটক লাগিয়ে দিলেন। এখান থেকেই শিকারের যাত্রা স্বরু হবে। যে হরিণের পালা পড়বে সে এই ফটক দিয়ে দৌড়ের জন্য নির্দিষ্ট পথে এসে ঢুকবে। রাজা এই জায়গায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে অপেক্ষা করবেন। হরিণ এখানে এসে জোরে দৌড়াতে স্বরু করলেই রাজা তার পিছু নিয়ে তাকে মারবার চেষ্টা করবেন।

রাজা আরও একটা বিষয়ে রাজি হলেন। কোনো হরিণ সারা পথটা এক-বার দৌড়ে পাক দিয়ে আবার শিকার আরম্ভের জায়গায় যদি ঘুরে আসতে পারে আর রাজা তাকে মারতে না পারেন তাহলে সেই হরিণ সেদিনকার মত রেহাই পাবে অর্থাৎ রাজা তাকে আর সেদিন শিকার করবেন না। পরের বার ভাগ্য পরীক্ষায় আবার তার নাম উঠলে তখন পালা আসবে, তার আগে নয়। কিন্তু রাজার লক্ষ্য এমনি অব্যর্থ ছিল যে কোনো হরিণই তাঁর হাত থেকে রেহাই পেতনা। তাই যে হরিণের যেদিন পালা পড়ত সে নিশ্চিন্ত জানত সেদিনই তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। কিন্তু তবু এটা আগের ব্যবস্থার চেয়ে ঢের ভাল কারণ তখন রাজা শিকারে এলেই একটা হরিণের মৃত্যু তো নিশ্চিতই ছিল উপরন্তু আরও প্রায় ছ'টা হরিণ জখম হত।

একদিন এক হরিণীর পালা পড়ল। তার তখন বাচ্চা হবে। হরিণী ভাবল, "আজ আমি মরলে পেটের বাচ্চাটাও আর জন্মাতে পারবে না। আমার সঙ্গে সেও মরবে। আর ক'টা দিন সময় পেলে ততদিনে বাচ্চাটা

হত আর তখন আমার মরতে একটুও দুঃখ ছিলনা।" এই হরিণী ছিল হিরণের দলে। হরিণী তার দলপতির কাছে গিয়ে তার শিকার হবার পালা কয়েক দিনের জন্যে মুলতুবি রাখতে আবেদন জানাল। হিরণ তার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে বলল, "ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু তোমার পালা আর কারুর ওপর কি করে চাপিয়ে দিই বল? প্রত্যেকেরই তো নিজের জীবনের দাম আছে আর সবাই যত বেশী দিন পারে বাঁচতে চায়। এখন তোমার জায়গায় অন্য কোনো হরিণকে যদি যেতে বলি তাহলে সেটা খুব অন্যায় হবে।"

বেচারী হরিণী বুঝতে পারল, দলপতি খুব ন্যায্য কথাই বলছে। সে বুঝল তার আর কোনো আশাই নেই তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি? সে তখন অন্য দলের দলপতি রোহান্তার কাছে গেল এই আশায়, যদি সেখানে

কোনো সুপরামর্শ পাওয়া যায়। রোহান্তা হরিণীর সব কথা খুব মন দিয়ে শুনল। সেও চিন্তা করে দেখল, হিরণ খুব সঙ্গত কথাই বলেছে ; হিরণ অন্য হরিণকে হরিণীর বদলে যেতে বললে সেটা অন্যায় হত।

তবে রোহান্তা হরিণীকে বলল, "তোমার বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত যেতে হবে না।"

হরিণী জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু আজ কি ব্যবস্থা করবেন ?"

"সে যা হোক করবখ'ন। তোমায় বাচ্চাকে নিয়ে একটুও ভাবতে হবে না।"

সেদিন রাজা শিকারে এসে সেখানে রোহান্তাকে দেখে ভারী আশ্চর্য হলেন।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্ধু, আমার আদেশ তুমি তো জান— তোমার বা অন্য দলের দলপতি হিরণের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। ভাগ্য পরীক্ষায় তোমার নাম রাখাটা মোটেই উচিত হয়নি। আমি নিজের

আদেশ নিজেই অমান্য করতে পারি না। তুমি ফিরে যাও, অন্য হরিণকে পাঠিয়ে দাও।''

রোহান্তা তখন রাজাকে সব ঘটনা খুলে বলল। সে বলল, ''এরপর আমি বা হিরণ যদি হরিণীর বদলে অন্য কোনো হরিণকে আসতে হুকুম দিতাম তাহলে তা খুবই অন্যায় হত। আমি তা করিনি। হরিণীর বদলে আমি নিজেই এসেছি।''

রোহান্তার কথায় রাজা এমনই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কথাই সরল না। একটু পরে রাজা বললেন, ''আজ শিকার বন্ধ থাকবে। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আবার কথা হবে। সন্ধ্যের সময় আমার সঙ্গে দেখা কর।''

সন্ধ্যের সময় রোহান্তা যখন রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন তিনি বললেন, ''আমি ভেবে দেখেছি, তোমাদের দুজনেরই প্রাণ রক্ষা করব। হরিণীর বা তোমার কারুরই কোনো ক্ষতি করব না।"

রোহান্তা রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, ''আপনি এই সিদ্ধান্ত করলেন কেন?

রাজা বললেন, ''এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমাকে কি এতই নিষ্ঠুর ও নির্দয় মনে কর যে আমি বেচারী হরিণীকে শিকার করব কিংবা তোমার মত এক মহৎ হৃদয় হরিণকে মারব?"

রোহান্তা তখন বলল, "আপনি একটু ভেবে দেখুন। আপনার এই মহানুভবতাপূর্ণ ব্যবহার দলের আর সব হরিণেরাও কি পাবার যোগ্য নয়?''

রাজা একটু চিন্তা করলেন তারপর এক মহান সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, ''আজ থেকে আমি হরিণ শিকার ত্যাগ করলাম। এই বাগান আজ থেকে হবে হরিণদের অভয়ারণ্য। শুধু তাই নয়, হরিণেরা চাষীদের ক্ষেত-খামারের ফসল নষ্ট না করলে বনে-জংগলে বা খোলা জমিতেও কেউ তাদের মারতে পারবে না।

প্রাচীন কালে সারা ভারতে এইভাবে অভয়ারণ্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল আমরা অন্য প্রাণীদের প্রতি আমাদের স্নেহ মায়া-মমতার প্রাচীন ঐতিহ্য বিস্মৃত হলাম। মানুষের নিষ্ঠুর হাতে এই ভারতবর্ষে শত শত কালো হরিণ যে ভাবে মারা পড়েছে তেমন আর কোনো প্রাণীই প্রাণ হারায়নি। কিন্তু আশার কথা এই যে, আমরা আজ আমাদের এই নিষ্ঠুরতার ফল বুঝতে পেরেছি। আর তাই সারা ভারতে কালো হরিণকে সংরক্ষিত প্রাণীরূপে ঘোষণা করা হয়েছে।
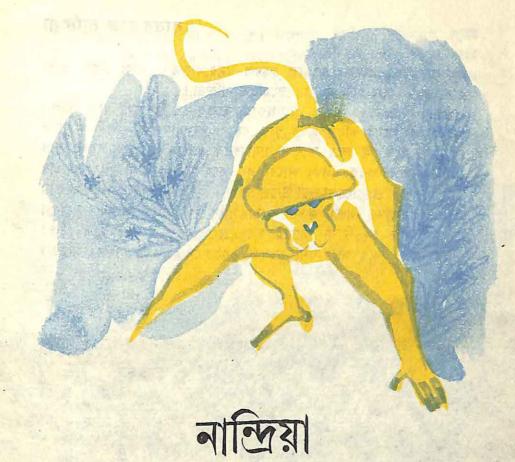
নান্দ্রিয়া

বানর রাজা

বানর রাজ নান্দ্রিয়া

এক সময় মধ্য প্রদেশের জংগলে একদল বানর থাকত। দলে একটা বাচ্চা হয়েছিল। তার মা-বাবা নাম রেখেছিল নান্দ্রিয়া।

বানর শিশু তরুণ বয়সে পরোপকারী হলেও খুব দুঃসাহসী হয়ে উঠল। সে একলাই বনের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। কোনদিন শেষে কি বিপদ ঘটে এই ভয়ে তার মা-বাবা তাকে এভাবে দল ছেড়ে একলা ঘুরে বেড়াতে নিষেধ করত, বলত, আরো বড় হয়ে বুদ্ধি-শুদ্ধি না পাকলে তার এভাবে একলা ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। নান্দ্রিয়া তারপর দিন কতক তার মা-বাবার কথামত চলত কিন্তু আবার তার ঘাড়ে সেই দুঃসাহসিকতার ভূত চেপে বসত। আর সে দিব্যি নিজের দল ছেড়ে এদিক-সেদিকে চলে যেত। অবশ্য সন্ধ্যে হবার আগে সূর্য ডুবতে না ডুবতে সে রোজ ঠিক ফিরে আসত।

একবার এমনি গাছে গাছে লাফাতে লাফাতে নান্ত্রিয়া একেবারে বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হল। বনের মধ্যিখানে যেখানে তার দলের সবাই থাকত সেখান থেকে এ জায়গাটা অনেক দূরে। নান্ত্রিয়া দেখল বনের চারপাশ ঘিরে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপ আর সেখানে অসংখ্য আম গাছে থোলো থোলো পাকা ফল বোঝাই হয়ে রয়েছে। দেখে নান্ত্রিয়া আনন্দে অধীর হয়ে উঠল।

তার সেই দ্বীপে যাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু নদীটা বেশ চওড়া। শুকনো অবস্থাতেও অবশ্য তার মত জোয়ান সবল বানরও অন্তত দু'লাফের কমে নদীটা পার হতে পারবে না। কিন্তু মাঝে বর্ষা হয়ে গেছে। নদীতে এখন জল দুকুল ছাপিয়ে উঠেছে। সে দেখল, নদীতে বেশ জল আর স্রোতও প্রবল।

নিরাশ হয়ে নাল্রিয়া দলে ফেরার কথা ভাবছে এমন সময় তার নজরে পড়ল, নদীর তীর আর দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় জলের ওপর কালো মত কি একটা দেখা যাচ্ছে। আর একটু কাছে গিয়ে সে ভাল করে দেখল সেটা বিরাট এক শিলাখণ্ডের ওপরের অংশ। জলের ওপর এই অংশটা জেগে আছে। বাকীটা জলের তলায়। নদীর জল সেই শিলাখণ্ডের চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে আছড়ে পড়ছে আর সেখানে দুধের মত সাদা ফেনা স্তূপীকৃত
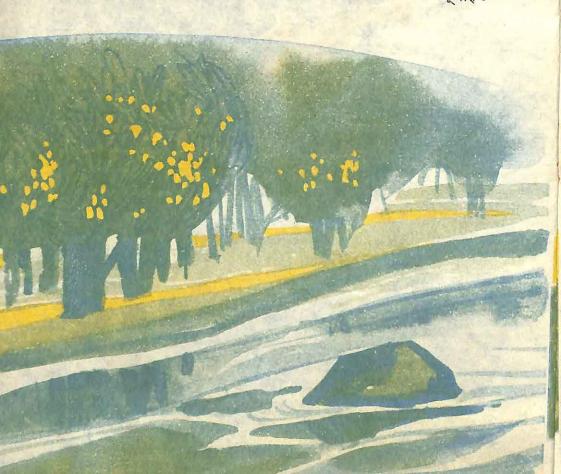
হচ্ছে। জলের ওপর পাথরের খুব বেশী অংশ দেখা যাচ্ছেনা। নান্দ্রিয়া মনে মনে আন্দাজ করল, সেখানে তার লাফিয়ে পড়বার মত জায়গা হবে। তারপর সে সেখান থেকে দ্বিতীয় আর এক লাফে দ্বীপে পৌঁছতে পারবে। কাজটা বিপজ্জনক। কিন্তু নান্দ্রিয়া ছিল ভীষণ তেজী আর জেদী প্রকৃতির। সে ঠিক দ্বীপে গিয়ে পৌঁছিল।

দ্বীপের আম গাছে অসংখ্য আম ফলেছিল। এমন সুস্বাদু ও সুগন্ধ আম নান্দ্রিয়া এর আগে কখনও খায়নি। পেটভরে যত পারল আম খেল। কিন্তু ঘরে ফেরার কথা ভাবতেই তার মনে হল পেট ভর্তি আম খেয়ে শরীর তার দ্বিগুণ ভারী হয়ে গেছে। এখন সে নড়তেই পারবে না। সত্যিই তার

তখন আর লাফাবার মত শক্তি ছিল না। সেইখানে তাকে ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নিতে হল। তা সত্ত্বেও সে লাফ দিয়ে ঠিক শিলাখণ্ডের ওপর পৌঁছতে পারল না। একটুর জন্যে পাথরের বাইরে জলের ওপর ছিটকে পড়ল। কোনোমতে পাথরের একটা কোণ আঁকড়ে ধরে প্রাণে বেঁচে গেল। নইলে প্রবল স্রোতে সে কোথায় ভেসে যেত। শিলাখণ্ডের ওপর উঠে বসে নাম্ব্রিয়া একটু দম নিল। নদীর কনকনে ঠাণ্ডা জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল। সে নিজের মনেই বলল, "আর কখনো এত লোভ করব না। ক্ষিদের জন্যে যেটুকু দরকার সেটুকুই খাব।" জিরিয়ে একটু সুস্থ হলে সে বিকেলের পড়ন্ত রোদে নিজের ভিজে শরীরটা একটু সেঁকে নিল। সেখান থেকে এক লাফে তীরে এসে আবার নিজের দলে ফিরে এল।
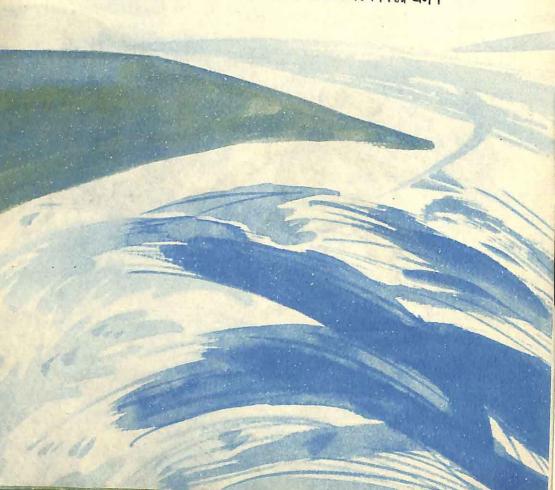
দলে ফিরে তার মা-বাবা আর দলের অন্য বানরদের কাছে নান্দ্রিয়া মহা উৎসাহে দ্বীপে যাওয়ার ঘটনা বলল। সেই সঙ্গে সেখানকার সেরা মিষ্টি আমের কথা বলতেও ভুল করল না। কিন্তু তরুণেরা উত্তেজনার বশে কল্পনার রাজ্যেই বাস করে। তাই সব জিনিসই তারা অতিরঞ্জিত করে বলে যে বড়রা তাদের সব কথায় আমল দেয় না। দলের সবাই ভাবল নান্দ্রিয়া হয় তাদের গাল-গল্প শোনাচ্ছে, নয়তো তাদের সরল মনে করে বোকা বানাচ্ছে। সে যখন দলের বানরদের সেই দ্বীপে যাবার কথা বলল তখন তারা উত্তর দিল "না, ধন্যবাদ, তুমি একলাই গিয়ে সেই চমৎকার আমগুলো খাও।"

নাভ্রিয়া অবশ্য তাদের কথামতই কাজ করল।

বর্ষার গোড়ায় নাভ্রিয়া এই দ্বীপটার সন্ধান পেয়েছিল। বর্ষা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হল। নাভ্রিয়া দেখল বর্ষায় নদীর জল বাড়বার সঙ্গে জলের ওপর পাথরের যে অংশটা দেখা যেত তা ক্রমশ অদৃশ্য হচ্ছে। এখন তাকে সেটার ওপর ভাল রকম নজর রাখতে হবে। যে দিন পাথরটা নদীর জলের তলায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবে সেদিন দ্বীপের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না। বর্ষার জল নামতে বেশ কিছু দিন লাগবে। জল কমলে তখন আবার পাথরটা নদীর বুকে জেগে উঠবে।

নদীর উজানে একটা বাঁকের ধারে প্রকাণ্ড একটা কুমির থাকত। কুমিরটা নাভ্রিয়ার ওপর নজর রেখেছিল—সে রোজ সকালে লাফ মেরে দ্বীপে যায় আর বিকেলে সেখান থেকে ফেরে। কুমিরটা লক্ষ্য করত।

বানরের মাংসের ওপর কুমিরটার ভারী লোভ ছিল। সে মনে মনে ঠিক করল, যেমন করে হোক তাকে নান্দ্রিয়ার মাংস খেতে হবে। কিন্তু নান্দ্রিয়ার কুমিরটাকে একদিনও নজরে পড়েনি কারণ সে জলের নিচে মাথা নিচু করে লুকিয়ে থাকত পাছে নান্দ্রিয়া তাকে দেখে ফেলে। কুমির জানত নান্দ্রিয়া তাকে কোনোদিন দেখে ফেললেই সে সাবধান হয়ে যাবে আর তাহলে কুমিরের ভয়ে দ্বীপে পা মাড়াবে না।

এদিকে বর্ষায় নদীর জল ক্রমশ বাড়তে লাগল। একদিন নান্দ্রিয়া নদীর ধারে এসে দেখল জলের ভীষণ স্রোত। স্রোতের ঘূর্ণি আর জলের ফেনায় পাথরটার খুব সামান্য অংশই নজরে পড়ছে। এ অবস্থায় বিপদের ঝুঁকি

নিয়ে লাফ দেওয়া উচিত হবে কিনা তাই সে চিন্তা করতে লাগল। সে ভেবে দেখল, বহুবার সে ওখানে লাফিয়ে গেছে। কাজেই পাথরের যেটুকু অংশ জলের ওপর নজরে পড়ছে তাতেই সে নিরাপদে লাফিয়ে পড়তে পারবে। পাথরের ওপর থেকে আর এক লাফে দ্বীপে যাওয়া মোটেই কষ্টকর নয়। নদীর অবস্থা দেখে এটাও সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে আজই এখানে তার শেষ আসা কারণ বর্ষার পর জল না কমলে দ্বীপে আর যাওয়া যাবে না।

এখন বেশ কিছুদিন সে আর দ্বীপে আসতে পারবে না এই কথা ভেবে নান্দ্রিয়া সেদিন অনেকক্ষণ দ্বীপে রইল। সাধারণত সে এতক্ষণ সেখানে থাকে না। এক সময় তার মনে হল অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাই সে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে জলের ধারে এসে দাঁড়াল। এখান থেকেই সে রোজ পাথরটার ওপর লাফ দেয়। গাছের মাথার নিচে সূর্য তখন ডুবুডুবু। নদীর জলে সন্ধ্যের ছায়া পড়েছে। অন্য দিন নান্দ্রিয়া যখন ঘরে ফেরে তখন জলের ওপর রোদ ঝিক্‌ঝিক্ করে।

সে লাফাতে যাবে এমনি সময় হঠাৎ একটু থামল। নান্দ্রিয়ার চোখে পাথরটা আজ যেন একটু অন্যরকম মনে হল। এর আগে তো জলের

ওপর পাথরটার খুব সামান্য অংশই দেখা যেত। আজ হঠাৎ সেটা এত বড় হল কি করে, ঠিক যেমন বর্ষার আগে ছিল ?

নাল্ড্রিয়া বিপদের গন্ধ পেল। দূর থেকে সন্ধ্যের আবছা আলোয় ওটাকে পাথর বলেই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু নদীর জল হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি নেমে গেল কি করে ? দ্বীপের কিনারায় পাথরের খাঁজের গায়ে জলের দাগ দেখে

তার মনে সন্দেহ আরো দৃঢ় হল। সেখানে জলের উচ্চতা দেখে বুঝল নদীতে জল কমেনি। নান্দ্রিয়ার তখন আর বুঝতে বাকী রইল না যে জলের কোনো অতিকায় জন্তু তাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছে। তার মাথায় একটা ফন্দি এল।

সে যেন পাথরটার সংগে কথা কইছে এমনি ভাব দেখিয়ে সেখান থেকে চিৎকার করে বলল, "ওহে ভায়া, আমি ফিরেছি।" কিন্তু কে তার কথার উত্তর দেবে? নান্দ্রিয়া তখন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে এমনি ভান করে কথা বলল, "কি ভাই পাথর, আজ যে আমার সঙ্গে কথা কইছ না?"

কুমির ভাবল, "সত্যিই তো তাহলে বানরটা রোজ পাথরের সংগে কথা বলে! আমিই আজ পাথরের হয়ে বানরের কথার উত্তর দিই না কেন!"

এই ভেবে কুমির জোর গলায় বলল, "ভাই কিছু মনে কর না। আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই তোমার কথা আগে শুনতে পাইনি।"

নান্দ্রিয়া এবার পরিষ্কার বুঝল যে যাকে সে পাথর বলে ভুল করছিল সেটা আসলে একটা বিরাট কুমির। তার শরীরের বেশীর ভাগটাই জলের নিচে রয়েছে আর প্রকাণ্ড মাথা সমেত দেহের বাকী অংশটা পাথরের ওপর দেখা যাচ্ছে। নান্দ্রিয়া কুমিরকে শুনিয়ে বলল, "তুমিতো আমার পাথর বন্ধু নও! তুমি কুমির। কি চাও তুমি?"

এভাবে তার জারিজুরি ফাঁস হয়ে গিয়ে কুমির ধরা পড়ে ভারী বিরক্ত হল। সে ভীষণ রেগে বলল, "আমি তোকে খেতে চাই।"

তখন ফেরার আর কোনো পথ নেই দেখে নান্দ্রিয়া কুমিরকে কৌশলে বোকা বানাবে ঠিক করল। সে চিৎকার করে বলল, "আমার যখন আর কোনো উপায় নেই তখন তোমার কাছেই সঁপে দিচ্ছি। আমি এখান থেকে লাফাবো, আমাকে খাবার জন্যে মুখ হাঁ করে থাক। বরং একটা কাজ কর, তোমার দুচোখ বুজে থাক কারণ বলা যায় না, লাফিয়ে সোজা তোমার মুখের মধ্যে না পড়ে দৈবাৎ যদি ফসকে তোমার মাথার ওপর সজোরে গিয়ে পড়ি তাহলে তোমর দুচোখ অন্ধ হয়ে যাবে।"

বোকা কুমির তাই করল। সে তার বিরাট মুখ হাঁ করে চোখ দুটো বেশ শক্ত ভাবে বুজে পড়ে রইল। প্রথমটায় নান্দ্রিয়া ভয় পেয়েছিল কিন্তু তখনই

মন শক্ত করে সেখান থেকে এমন আন্দাজ করে লাফালো যাতে কুমিরের হাঁ করা মুখের কাছ থেকে অনেক তফাতে তার পিঠের ওপর গিয়ে পড়ে। কুমিরের পিঠটা পাথরের মত কঠিন। তার ওপর লাফিয়ে পড়েই সে চোখের নিমেষে আর এক লাফে একেবারে ওপারে গিয়ে পৌঁছুল। অতিকষ্টে একটা গাছে চড়ে সেখান থেকে নান্দ্রিয়া কুমিরকে ঠাট্টা করে বলল, "ওরে মাথামোটা কুমির, আজ আর তোর আমাকে খাওয়া হলনা। আজ বরং তুই নিজের ল্যাজটাই খেয়ে দেখ।"

এরপর কয়েক বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে বানরদের দলপতি মারা যেতে সবাই মিলে নান্দ্রিয়াকেই তাদের নতুন দলপতি নির্বাচিত করেছে। তার সাহস ও বুদ্ধির সবাই খুব তারিফ করত।

বানরেরা যেখানে ছিল সেখানে ফলের গাছপালা বেশী ছিল না। নান্দ্রিয়া স্থির করল এখন সকলে মিলে সেই আমগাছের দ্বীপেই যাওয়া
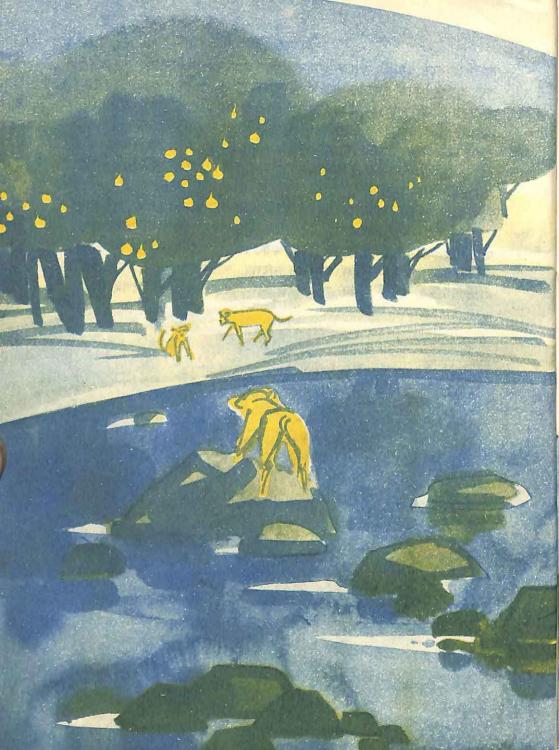
উচিত। নান্দ্রিয়া যতটা বলছে আসলে দ্বীপটা ততটা ভাল কিনা সে বিষয়ে দলের বুড়ো বানরদের মনে তখনো যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু তরুণ বানরেরা নতুন জায়গায় যাবার আনন্দে নেচে উঠল।

ওদের দ্বীপে যাওয়া ঠিক হতে হতে ততদিনে গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল। একদিক দিয়ে ওদের পক্ষে এটা ভালই হল কারণ তখন নদী প্রায় শুকনো। জল কম থাকায় নদী গর্ভের পাথরগুলো বেরিয়ে পড়েছে। এক পাথর থেকে অন্য পাথরগুলো বেরিয়ে পড়েছে। এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে বাচ্চা বানরেরাও সহজেই নদী পার হয়ে গেল। বুড়ো বানরদের মনে জায়গা সম্পর্কে যে সব আশংকা ছিল সেখানে পৌঁছে তা দূর হল। তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল যে জায়গাটা চমৎকার।

কিন্তু তাদের এক ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল।

গ্রীষ্মের কাঠফাটা দিনে রোদের উত্তাপ বাড়বার সংগে সংগে বানরদের তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যেত আর তারা ঘনঘন জল খেতে নদীতে নামত। ওদিকে নদীর জলও দিন দিন শুকিয়ে আসছিল। স্রোতহীন জলের ধারা নানাদিকে গড়িয়ে ছোটখাট ডোবার সৃষ্টি করেছিল। কয়েকদিন পরে ডোবা-গুলোতেও কাদাগোলা বদ্ধ জল পড়ে থাকল। শেষে তাও রইল না, ডোবা-

গুলোও এক এক করে শুকিয়ে কাঠ। নদী পার হয়ে দ্বীপের যেখানে বানরেরা এসেছিল সেখানে আশেপাশে তাদের চেনা জায়গার কোথাও একটুও জলের নাম গন্ধ নেই। তখন দলবল নিয়ে তারা নদীর ধার ধরে উজানের দিকে এগিয়ে চলল যদি কোথাও জলের সন্ধান মেলে। এইভাবে যেতে যেতে তারা নদীর একটা বাঁকের কাছে এসে পৌঁছল। এখানে নদীর পাড় হঠাৎ ঢালু হয়ে খাড়া নিচের দিকে গেছে। সেখানেই এক জায়গায় একটা বড় ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। ডোবায় তখনও প্রচুর জল ছিল।

ডোবাটা প্রথমে দলের তরুণ বানরদেরই চোখে পড়ে। তারা আনন্দে অধীর হয়ে হুড়মুড় করে সেখানে জল খেতে নেমে যাচ্ছিল এমন সময় ওদের একজন চিৎকার করে বলল, ‘‘দাঁড়াও।’’

তখন দলের আর সবাই তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। সেই বানরটি কোনো কথা না বলে শুধু ডোবার ধারে নরম ভিজে মাটির দিকে আঙ্গুল দেখাল। ভিজে মাটিতে খরগোশ, সজারু প্রভৃতি ছোট ছোট অনেক জন্তুর অসংখ্য পায়ের ছাপ পড়েছে। পায়ের ছাপগুলো খুঁটিয়ে দেখলে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়। সব পায়ের ছাপই ডোবায় নেমে গেছে কিন্তু ডোবা থেকে জল খেয়ে এই সব জন্তুদের ফিরে যাবার পায়ের ছাপ সেখানে নেই। ব্যাপারটা যে বেশ গোলমেলে তা বোঝাই যাচ্ছিল তাই বানরেরা সব কথা তাদের দলপতি নান্দ্রিয়াকে জানাবার সিদ্ধান্ত করল। নান্দ্রিয়া ডোবার ধারে এসে পায়ের ছাপগুলো ভালো করে পরীক্ষা করল। ডোবার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেখানটাও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল। ডোবার চারধারে নলখাগড়ার ঝোপ। নলখাগড়া দেখতে অনেকটা কচি বাঁশ বা বেতের মত। নলখাগড়ার ঝোপের দিকে খুব ভাল করে দেখতেই নান্দ্রিয়ার নজর পড়ল তারই ভেতর ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে তার সেই পুরোনো শত্রু কুমির। কুমিরের নাক উঁচু

লম্বা মাথাটা তার নজর এড়ায়নি। কুমির বুঝতে পারল তাকে সবাই দেখে ফেলেছে কাজেই গা ঢাকা দেবার বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ নেই। ঝোপের ভেতর থেকে নিস্ফল আক্রোশে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হতভাগা বানরগুলো সব মরবে, কেউ রেহাই পাবে না। এখানে জল খেতে এসে কেউই রেহাই পায়নি। তোদের সকলকেও খাব। এখানে যদি জল খেতে না আসিস তাহলে তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরবি। আমার এই ডোবায় ছাড়া আর কোথাও জল পাবি না। আর বর্ষা আসতে এখনো দু'মাস বাকী।"
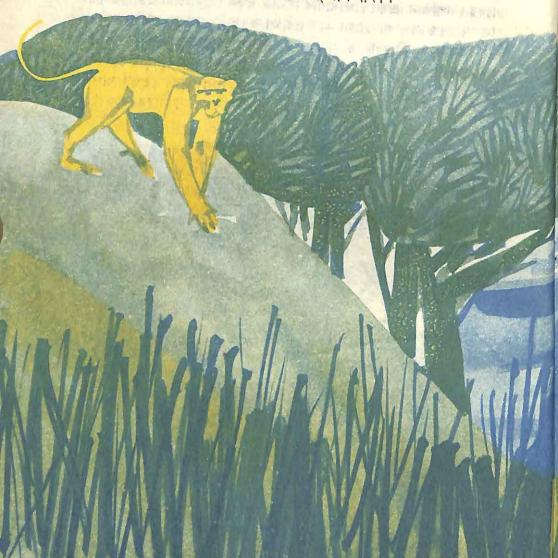
নান্দ্রিয়া অনেকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে তেষ্টার চোটে বানরদের গলা শুকিয়ে গেছে বিশেষ করে বাচ্চাগুলোর অবস্থা শোচনীয়। তখন নান্দ্রিয়ার মাথায় দারুণ একটা বুদ্ধি খেলল।

নান্দ্রিয়া দলের বানরদের নির্দেশ দিল, "তোমরা সবাই কুমিরের কাছ থেকে দূরে সরে থাক আর ডোবার ধারে ধারে ছড়িয়ে পড়। এবার নলখাগড়ার ঝোপ থেকে কয়েকটা লম্বা দেখে নল তুলে আনো।" নান্দ্রিয়া নিজেও একটা নল ছিঁড়ে আনল সেটার কচি ডগার দিকটা দাঁতে করে কেটে বাদ দিয়ে তাতে ফুঁ দিল। কিন্তু তার ভেতর দিয়ে হাওয়া গেল না কারণ সেটার মুখের কাছেই গাঁট ছিল তাতেই বাতাস আটকে গেল। তখন সে আরেকটা নলখাগড়া নিয়ে এল। এর গাঁটটা অনেক নিচের দিকে। নান্দ্রিয়া নলখাগড়ার ঠিক ওপরের খানিকটা অংশ কেটে বাদ দিল তারপর তাতে ফুঁ দিতেই নলের অন্য দিক দিয়ে এবার বাতাস বের হল, কারণ এর রাস্তা পরিষ্কার। কুমির যেখানে ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল সেখান থেকে নান্দ্রিয়া

কিছু দূরে সরে গেল তারপর নলের একপ্রান্ত জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল। নলটা যতটা লম্বা তীরের ওপর সেটাকে ততদূর টেনে নিয়ে গেল সে। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে নলের অন্য প্রান্তে মুখ দিয়ে জল টেনে খেতে লাগল। নান্দ্রিয়ার শুকনো গলাটা এতক্ষণে একটু ভিজল। দলের অন্য বানরেরাও এবার নান্দ্রিয়ার দেখাদেখি এই উপায়ে জল খেতে লাগল।

দলের কয়েকটা বাচ্চা বানর দূরে দাঁড়িয়ে কুমিরের দিকে তাকিয়ে তাকে ভেংচি কাটছিল। বাচ্চাগুলোর এই ধৃষ্টতা দেখে কুমির তো রেগে আগুন। সে তাদের ধরতে গেল কিন্তু চর্বিতে বোঝাই বিরাট দেহ নিয়ে কুমিরের তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করাই দায়। সে এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছুবার আগেই বানরেরা ততক্ষণে সেখান থেকে জল খাওয়া শেষ করে একটা গাছে চড়ে বসেছে। কুমির বার কয়েক নলখাগড়ার ডাঁটিতে কামড় বসিয়ে সেগুলো টেনে ফেলে দিল। বানরের দল তখন ডোবার চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে আর নতুন নলখাগড়া টেনে এনে তা দিয়ে জল খাচ্ছে। বোকা কুমির বার কতক জল ছিটিয়ে বানরদের তাড়া করল কিন্তু তখুনি ক্লান্ত হয়ে গাছের গুড়ির মত মাটিতে পড়ে থাকল। বানরগুলোর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে সে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগল।

ছ'মাস পর বর্ষা নামল। এখন বানরদের আর সেই ডোবায় জল খেতে যেতে হয় না। বর্ষার জলে নদী আবার ভরে উঠেছে। নদীর ধারে যেখানে খুশী তারা এখন জল খেতে পারে।

অধিকাংশ আমগাছই নদীর ধার থেকে অনেকটা দূরে দ্বীপের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু একটা গাছ ছিল নদীর একেবারে পাড়ের ওপর। এটা দ্বীপের অপর দিকে, নদীর মধ্যে যে জায়গায় পাথরটা ছিল তারই উল্টো দিকে। গাছটার একটা উঁচু ডাল এত লম্বা যে সেটা নদীর অপর পাড়ের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছিল। ডালটা শুকনো। এতে পাতা বা ফল কিছুই ছিলনা। এর নিচেই একটা কচি ডাল গজাচ্ছিল। এই নতুন ডালে অসংখ্য পাতা বেরিয়েছিল। আমের মুকুলের সময় ডালটা মুকুলের ভারে প্রায় নুয়ে পড়েছিল।

নান্দ্রিয়া চিন্তা করে দেখল, এই ডালটায় আম হলে তার পরিণাম বানরদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। কারণ দু'চারটে পাকা আম নদীতে পড়ে স্রোতের টানে ভেসে যাবে। খুব সম্ভব এই ছোট নদীটা কোনো একটা নদীতে গিয়ে পড়েছে আর সেই বড় নদীর দু'ধারে নিশ্চয়ই শহর গ্রাম আছে। স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমগুলো সেই শহর বা গ্রামের লোকেদের হাতে পড়লে তারা নিশ্চয়ই আমবাগানের খোঁজে সেই দ্বীপে এসে হাজির হবে। তারপর চরম পরিণাম হবে বানরকুলের নিধন কিংবা দ্বীপ থেকে তাদের নির্বাসন।

তাই নান্দ্রিয়া দলের সকলকে এই বলে সাবধান করে দিল যে ওই ডালটায় আম ধরলে তা জামের মত বড় হলেই তারা যেন খেয়ে ফেলে। বানরেরা নান্দ্রিয়ার এই নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিল।

কিন্তু ডালটার একেবারে আগায় পিঁপড়ের একটা বাসা হয়েছিল। পিঁপড়ের বাসার আড়ালে একটা আম বড় হয়ে তাতে রং ধরেছিল। পিঁপড়ের কামড়ের ভয়ে বানরেরা ডালটার আগার দিকে যেত না। তাছাড়া পিঁপড়ের বাসার আড়ালে থাকায় মাটির ওপর থেকে আমটা দেখা যেত না।

আমটা পাকা টুসটুসে হয়ে একদিন নদীর জলে পড়ল আর স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে বড় নদীতে চলে গেল। এই নদীর ধারে ছিল সেই দেশের রাজার রাজবাড়ী আর তারই লাগোয়া ছিল রাজার ঘরোয়া স্নানের ঘাট। আমটা তখনো বেশ টাটকা ছিল। রাজা খেয়ে দেখলেন এমন সুস্বাদু ও সুগন্ধ আম তিনি এর আগে কখনো খান নি।

আম খেয়ে রাজা স্থির থাকতে পারলেন না। এমন আম যে বাগানে জন্মায় তার খোঁজ তাঁর চাইই চাই। রাজা নিজেই একদল তীরন্দাজ সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় করে বেরিয়ে পড়লেন। বড় নদী ছাড়িয়ে তাঁরা ছোট নদীতে গিয়ে পড়লেন। নদী তীরের গাছপালা দেখতে দেখতে রাজা শেষে সদলবলে দ্বীপের সেই আম্রকুঞ্জে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজা দেখলেন দ্বীপটা বানরে ভর্তি। তিনি তখনই বানরবংশ ধ্বংস করতে চাইলেন কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে দেখে রাজা তীরন্দাজদের হুকুম করলেন, "যে সব গাছে অনেক আম আছে সেগুলোতে কড়া পাহারা দাও। আজ রাতে বানরেরা যেন গাছের একটি ফলও চুরি করে খেতে না পারে। কাল ভোর হতে না হতে আমরা ওদের শেষ করব।"

রাজা যে গাছটার নিচে বসে তাঁর দলবলকে হুকুম দিচ্ছিলেন তারই ওপর পাতার ঝোপের আড়ালে একটা অল্প বয়সী বানর লুকিয়ে বসে আড়ি পেতে সব কথা শুনছিল। রাজার হুকুম শুনেই সে নিঃশব্দে গাছে গাছে লাফ দিয়ে দ্বীপের এক প্রান্তে এসে হাজির হল। সেখানে নান্দ্রিয়া থাকত। দলপতিকে সব কথা বলে সে হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কাল তো সবাইকে মরতেই হবে।"

সব কথা শোনার পর নান্দ্রিয়া অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে চিন্তা করল তারপর বানরটিকে বলল, "মনে হচ্ছে একটা উপায় আছে। তুমি এখুনি গিয়ে দলের সকলকে খবর দাও তারা যেন এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বীপের অপর দিকে নদীর পাড়ে যে আমগাছটায় শুকনো ডাল আছে তার তলায় এসে সবাই জড়ো হয়।"

ভরা বর্ষায় নদীতে তখন জল ছাপিয়ে উঠেছে। দ্বীপে প্রথম আসার সময় বানরেরা তীর থেকে নদীর ভেতরের যে পাথরটার ওপর লাফিয়ে পড়েছিল এবং সেখান থেকে লাফ দিয়ে দ্বীপে এসেছিল, সেই পাথরটা ভরা বর্ষার নদীতে জলের নিচে কোথায় অদৃশ্য হয়েছিল। বানরদের পালাবার সে পথ বন্ধ। তাই নান্দ্রিয়া দ্বীপের উল্টোদিকে গেল। পাড়ের ধারে সেই আম-গাছটায় চড়লো। গাছের যে শুকনো ডালটা নদীর অপর পাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল তাতে উঠে সে খুব সন্তর্পনে এগুতে লাগল। ডালটার শেষ প্রান্তে এসে নান্দ্রিয়া মনে মনে আন্দাজ করে দেখল যে সেখান থেকে লাফ দিয়ে সে নদীর অপর পাড়ে ঠিক পৌছতে পারবে। এইভাবে সে লাফ দিয়ে অপর পাড়ে একটা গাছের ওপর পৌছল। এবার মনে মনে সে তার লাফের দূরত্বের একটা হিসেব করল। গাছ থেকে নেমে বাঁশঝাড় থেকে তার হিসেব অনুযায়ী সরু অথচ মজবুত দেখে একটা বাঁশ টান দিয়ে বের করে নিল। আসলে ঝাড়ের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাঁশ। নান্দ্রিয়া

আবার সেই গাছটায় উঠল। নদীর মুখোমুখি গাছের একটা ডাল ছিল। সে সেই ডালটার সঙ্গে বাঁশের একটা প্রান্ত বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল তারপর নিজে খুব সাবধানে বাঁশের ওপর চড়ে বসল। সত্যি কথা বলতে কি কাজটা ছিল ভীষণ কঠিন কারণ বাঁশটা তেমন মোটা নয় আর তেলামত বলে পিছলে যাবারও ভয় ছিল। সে যাই হোক, নান্দ্রিয়া এইভাবে তো কোনোমতে বাঁশের শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। বাঁশের ডগাটা নিজের কোমরের সঙ্গে ভাল করে বাঁধল। এবার সে বাঁশের ডগাটাকে এদিক থেকে ওদিকে দোলাতে লাগল। এভাবে বাঁশটা শূন্যে দোল খেতে খেতে ক্রমশ নদীর ওপর দিয়ে ওপারে দ্বীপের পাড়ের ওপরের আমগাছের শুকনো ডালটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। নান্দ্রিয়া এক সাংঘাতিক বিপজ্জনক কাজে নেমেছিল। নিচে বর্ষার খরস্রোত নদী আর তারই ওপর শূন্যে অবাধ গতিতে আন্দোলিত এক বাঁশের ওপর সে বসে রয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে সেখান থেকে ফসকে নিচে পড়লে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ভাগ্যক্রমে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেনি। বাঁশের ডগা দুলতে দুলতে শুকনো ডালটার কাছাকাছি আসতেই নান্দ্রিয়া সেটা ধরে ফেলল।

নান্দ্রিয়ার মতলব ছিল বাঁশের ডগাটা নিজের কোমর থেকে খুলে শুকনো ডালে সেটা বেঁধে দেওয়া। তাহলে নদীর ওপর দিয়ে এপার ওপার করার মত একটা বাঁশের সেতু তৈরী হবে। বাঁশের এই সেতুটা সংকীর্ণ হলেও নিরাপদ হবে। কিন্তু নান্দ্রিয়া এখন দেখল, সে শুকনো ডালের শেষ প্রান্ত থেকে ওপারের গাছে লাফ দিয়ে এই ফাঁকটার দূরত্বের যে হিসেব মনে মনে করেছিল তা ভুল। বাঁশটা সেই হিসেবে দু'ফুটের মত ছোট হচ্ছে। এই ফাঁকটা অবশ্য তার নিজের শরীরের কোমর থেকে ওপরের অংশ দিয়ে পূরণ হচ্ছে। দাঁত দিয়ে বাঁধনটা কেটে সে যদি এখন কোমর থেকে বাঁশটা খুলে দেয় তাহলে সেটা এখুনি ছিটকে ওপারে গিয়ে পড়বে। সে আবার নতুন করে সেতুটা বানাবার চেষ্টা করবে কিনা চিন্তা করল। ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বীপের মধ্যে কিসের একটা সোরগোল শোনা গেল। ভোর হবার অপেক্ষা না করেই রাজার তীরন্দাজেরা বানর শিকার সুরু করে দিয়েছে।

আর চিন্তা করার একটুও সময় নেই। এখন একমাত্র উপায় হল তার নিজের শরীর দিয়ে বাঁশের সেতুর ওই ফাঁকটুকু ভরাট করা।

গাছের নিচে বানরেরা ততক্ষণে এসে জড়ো হয়েছে। নান্দ্রিয়া তাদের চাপা গলায় বলল, গাছে উঠে তারা যেন একে একে সেতুর ওপর দিয়ে নদীর ওপারে চলে যায়। বানরেরা সংখ্যায় ছিল অনেক। শরীরের ওপর এই পীড়নের ফলে কিছুক্ষণ পর নান্দ্রিয়ার কষ্ট হতে লাগল। নান্দ্রিয়ার তখন আর জোয়ান বয়স নেই। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সে বুকের কাছে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল, তার মনে হল এখন কেউ তার শরীর মাড়িয়ে গেলে আর সে বাঁচবে না। কিন্তু তখনো একটা বানর পার হতে বাকী—এক বানরী আর তার দুটো কচি বাচ্চা ভয়ে মায়ের বুক আঁকড়ে ধরে আছে। নান্দ্রিয়া শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইল। কাউকে বুঝতে দিল না কি ভীষণ যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছে। শুধু ফিস ফিস করে বানরী মাকে সে তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে বলল।

বানরী নিরাপদে ওপারে গাছের ওপর গিয়ে পৌঁছল আর চরম দুর্ঘটনা ঘটল ঠিক তারপরেই। বাঁশের ওপর দিয়ে ক্রমাগত এতগুলি বানর যাওয়ার ফলে তার চাপে ওপারে গাছের ডালের সঙ্গে বাঁশের বাঁধন ক্রমশ আলগা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একসময় সেই বাঁধন গেল ছিঁড়ে। অসহ্য বুকের যন্ত্রণায় নান্দ্রিয়ার তখন প্রায় জ্ঞান ছিল না। আচমকা সে এই ধাক্কা আর সামলাতে পারল না, একেবারে সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ থেকে রাজা সকলের অলক্ষ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে বানরদের কাণ্ড-কারখানা দেখছিলেন। আবছা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট সব কিছু দেখতে না পেলেও এটা বুঝেছিলেন যে বানরেরা দ্বীপ ছেড়ে পালাচ্ছে। এতেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কাজেই কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তিনি সব দেখছিলেন। কোমরে বাঁশ বাঁধা অবস্থায় এভাবে নান্দ্রিয়াকে ওপর থেকে সশব্দে নিচে পড়তে দেখে তিনি এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। রাজা নান্দ্রিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে পরম যত্নে তার সেবা শুশ্রূষা করলেন কিন্তু বুঝতে পারলেন তার আর বাঁচবার আশা নেই।

রাজা বললেন, "হে মহৎ হৃদয় বানররাজ। পরের স্বার্থে কোনো মানুষকেও এভাবে আত্মবলি দিতে দেখিনি বা এমন কথা কারুর মুখে শুনি নি। তোমার যদি কোনো শেষ ইচ্ছা থাকে বল সাধ্যমত পূর্ণ করব।"

খুব ক্ষীণকণ্ঠে নান্দ্রিয়া বলল, "দলের সবাই আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়।

এরা যাতে কোনো দুঃখ কষ্ট না পায় দেখবেন।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নান্দ্রিয়ার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

সব কিছু দেখেশুনে রাজা এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি স্থির করলেন এই দ্বীপ আর অধিকার করবেন না, বানরদেরই আবার ফিরিয়ে দেবেন। ভোর হতেই তিনি তাঁর সৈন্যদের দ্বীপ থেকে ওপারে যাবার জন্যে বেশ মজবুত একটা বাঁশের সেতু বানিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। ওপারে বসে বানরেরা রাজার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কিন্তু রাজার মনে আসলে কি আছে তা সঠিক না জেনে তারা এপারে আসতে সাহস করেনি। বানরেরা যখন দেখল রাজা তাদের দলপতি নান্দ্রিয়ার শেষকৃত্যের উদ্যোগ আয়োজন করছেন তখন তাদের মনে আর কোনো সন্দেহই রইল না যে নান্দ্রিয়ার বিয়োগে রাজাও তাদের মতই সমান দুঃখী। বানরেরা দলে দলে এপারে ফিরে এসে তাদের দলপতির আত্মার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানালো।

শেষকৃত্যের পর রাজা সেই দ্বীপে একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করালেন। এই স্তম্ভের নিচে একটি ফলকে রাজার আদেশ লিখে রাখা হল—এখানে কোনো মানুষ যেন অনধিকার প্রবেশ না করে। এই দ্বীপ বানরদের জন্য অভয়ারণ্য করা হল। দ্বীপ ছেড়ে যাবার সময় রাজা সঙ্গে শুধু কয়েকটি আম নিয়ে গেলেন। এই আমের আঁটি তিনি রাজপ্রাসাদের বাগানে লাগাবেন। আঁটি থেকে আমের চারা বেরিয়ে সেই গাছ বড় হলে তাতে মধুর মত মিষ্টি আম তাঁকে চিরজীবন মহানুভব নান্দ্রিয়ার আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করাবে।

এই পর্যায়ে প্রকাশিত বই ঃ

বই	লেখক
বাপু (মহাত্মা গান্ধীর সচিত্র জীবনী—দুই খণ্ডে)	লেখা ও চিত্র : এফ. সি. ফ্রীট চিত্রশিল্পী : প্রেমানন্দ শর্মা
কাশ্মীর	লেখিকা : মালা সিং
পক্ষী জগৎ	জমাল আরা
নদী কথা	লীলা মজুমদার
শিখর থেকে শিখরে	ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং
স্বর্গ ভ্রমণ ও অন্যান্য গল্প	লীলাবতী ভাগত
সরস গল্প	মনোজ দাস
স্বরাজ্যের কথা (১ম খণ্ড)	বিষ্ণু প্রভাকর
আমাদের রেলের কথা	জগজিৎ সিং
ভারতে বিদেশী যাত্রী	কে. সি. খান্না
এস আমরা নাটক করি	উমা আনন্দ
বাঘের মাসী বেড়াল	এম. ডি. চতুর্বেদী
সে অনেক কালের কথা	এম. চোকসী ও পি. এম. যোশী
রোহান্তা ও নান্দ্রিয়া	কৃষ্ণ চৈতন্য
যুগ যুগের কাহিনী	শান্তা রঙ্গচারী
বড় পানি	লীলা মজুমদার
বীরের কাহিনী	রাজেন্দ্র আয়ন্তী
যে সব আবিষ্কারে দুনিয়া পাল্টে গেছে (দুই খণ্ডে)	মীর নীজাবত আলী
স্বরাজ্যের কথা (২য় খণ্ড)	সুমঙ্গল প্রকাশ
ভারতের হকি খেলা	শরদিন্দু সান্যাল
মোরা	মুলক্ রাজ আনন্দ
ডাকটিকিটের মজার কাহিনী	সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
অলিম্পিক ও তার নায়কেরা	মেলভিল ডিমেলো
অযোধ্যার রাজকুমার	হংস মেহতা
গাছের কথা	রাস্কিন বণ্ড

এইসব বই সমস্ত ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়